প্রথম আলো

কলাম

মতামত

বিশ্ববিদ্যালয় কেন রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা দখলের মঞ্চ

মনোজ দে

আপডেট: ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ৫৫

নব্বই-পরবর্তী বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির মূল প্রবণতা হচ্ছে, এখানে ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠন শিক্ষার্থীদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তাদের ওপর বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিয়েছিল। জোর করে মিছিলে যেতে বাধ্য করা থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত গেস্টরুমে নিয়ে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন ছিল নিয়মিত ঘটনা।

ছাত্ররাজনীতির নামে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ সুপিরিয়র হয়ে উঠেছিল। সরকারি দলের ভাড়াটে বা ঠ্যাঙারে বাহিনী হয়ে তারা শিক্ষার্থীদের দমন-পীড়ন চালাক।

ক্ষমতাসীন ছাত্র নেতৃত্বের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের এই সম্পর্ককে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সামন্ত প্রভু-ভূমিদাস সম্পর্ক দিয়ে। বিগত বছরগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের যেভাবে ছাত্রনেতাদের কুর্নিশ করতে দেখা যেত, সেটা এ ধরনের সামাজিক সম্পর্কেরই প্রতিফলন। শিক্ষার্থীদের প্রতিনিয়ত নিজেদের আত্মমর্যাদার সঙ্গে আপস করেই কায়দা করে বেঁচেবর্তে থাকতে হতো।

একমাত্র সেনানিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছর বাদে এই চিত্রের ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। ক্ষমতা পরিবর্তনের আগে ও পরে যাঁদের হলে থাকার অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাঁরা ভালো করেই জানেন যে সরকার বদলের রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে কীভাবে স্লোগান বদলে যায়। মজার বিষয় হলো, সামনের সারির কিছু মুখই এখানে বদলায়। নিপীড়ন কাঠামো বদলায় না। ফলে যৌন-সন্ত্রাস থেকে শুরু করে পিটিয়ে হত্যা—সব ধরনের সহিংসতা চালু থাকে ক্যাম্পাসে।

এ বাস্তবতায় গত ৩৫ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেসব বড় আন্দোলন হয়েছে, তার সিংহভাগই ধরনের দিক থেকে নিপীড়নবিরোধী আন্দোলন।

জাহাঙ্গীরনগরে ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শামসুন নাহার হলে মধ্যরাতে পুলিশ ঢুকে ছাত্রী নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিপীড়নবিরোধী আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে সেনাসদস্য কর্তৃক ছাত্র নিপীড়নের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা জরুরি শাসনবিরোধী আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান হলে আবু বকর নিহত হওয়ার ঘটনায় গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলনসহ অসংখ্য আন্দোলন হয়েছে, যা ধরনের দিক থেকে ছিল নিপীড়ন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

এ সময়টাতে যারাই ক্ষমতায় এসেছে, তারাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জাতীয় রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের মঞ্চ করে তুলেছিল। দীর্ঘ ৯ বছরের সংগ্রামে সামরিক স্বৈরাচার এরশাদের পতনের পর দেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে তার উল্টো যাত্রাটাই দেখা যায়। ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে ছাত্রদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল।

এর কারণটা স্পষ্ট। সাতচল্লিশ থেকে শুরু করে নব্বই পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে রাজনৈতিক দলগুলো খুব পরিকল্পিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেননা, এ দেশের ছাত্ররা খুব স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতাবিরোধী। সে কারণেই ছাত্ররাজনীতি বারবার করে জাতীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে।

নব্বইয়ের পরে একদিকে গণতান্ত্রিক রাজনীতির পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠন দিয়ে লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ছাত্ররাজনীতি, শিক্ষক রাজনীতি, কর্মকর্তা-কর্মচারী রাজনীতির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে যে শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে ঝাড়ুদার, মালি, দারোয়ান নিয়োগ—সবখানেই রাজনৈতিক আনুগত্যই একমাত্র বিবেচ্য হয়ে উঠেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের বদলে ভোটার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই অতিনিয়ন্ত্রিত রাজনীতিকৃত

বিশ্ববিদ্যালয় এমন এক দম বন্ধ করা পরিবেশ তৈরি করেছে, যেখানে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের ন্যূনতম সুযোগটাও নেই।

শিক্ষার্থীদেরও এটা ভাবা প্র্যাকটিস করা জরুরি যে তাঁরা নিজেদের কোন ভূমিকায় দেখতে চান। ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজনীয়তা যে ফুরায়নি, চব্বিশের অভ্যুত্থান তার প্রমাণ। কিন্তু ছাত্ররাজনীতি, শিক্ষক রাজনীতির ধরনটা কী হবে, তা নিয়ে ভাবার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে।

দুই.

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্লাডিয়েটর খেলার রাজনৈতিক মঞ্চে যাঁরা পরিণত করছেন, তাঁদের সন্তানদের কেউই এখন আর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে না। রাজনীতি ও অর্থনীতির যাঁরা নিয়ন্ত্রক, তাঁদের সন্তানেরা বিদেশে পড়েন। ভোটের আগে তাঁরা দেশে ফেরেন। বাবা, দাদার কোটায় তাঁরা এমপি, মন্ত্রী হয়ে যান।

একসময় শহুরে ও বুদ্ধিবৃত্তিক মধ্যবিত্তের সন্তানদের বড় একটা অংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লেও নব্বইয়ের পর তাদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেতে পেতে এখন প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকেছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় মানেই সন্ত্রাস, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় মানেই সেশনজট, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় মানেই দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি, এ রকম ধারণা সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এ থেকে মুক্তির পথ হিসেবে বুদ্ধিবৃত্তিক মধ্যবিত্তের একাংশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে, আরেক অংশ দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। বুদ্ধিবৃত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি না আসায় সেক্যুলারিজম, সাম্যবাদ, গণতন্ত্র, উদারতাবাদ, বিশ্বজনীনতাবাদ—এসব বৈশিষ্ট্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেকটাই হারিয়ে যাচ্ছে।

এর বদলে গত দুই দশকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের নতুন উঠতি মধ্যবিত্ত (আয়ের মাপকাঠিতে) পড়তে আসছে। সাম্প্রতিক কালে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচয়বাদী সংস্কৃতিই আধিপত্য করতে দেখা যাচ্ছে।

তিন.

বিশ্ববিদ্যালয় কেন পড়াশোনা ও গবেষণার বদলে রাজনীতিটাই প্রধান হয়ে উঠেছে, সেই সূত্রটাও খুঁজতে হবে আমাদের অভিজাত শ্রেণির আয়না দিয়েই ব্যাখ্যা করা জরুরি। উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র গঠন পর্বে বিশ্বজুড়ে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা ছিল অনিবার্য। এরপর সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া দেশগুলোতে যখন সামরিক শাসন গেড়ে বসেছিল, সেখান থেকে মুক্তির ক্ষেত্রেও ছাত্র আন্দোলনের ইতিবাচক ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক পর্বে ও বাংলাদেশের সামরিক স্বৈরাচার পর্বে আমাদের ছাত্র আন্দোলনেরও গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। কিন্তু এই দুই পর্ব শেষ করে যেসব দেশ সামাজিক স্থিতিশীলতা আনতে পেরেছে, তাঁরা শিক্ষাকে রাজনৈতিকভাবে না দেখে সামাজিক বিনিয়োগ হিসেবে দেখেছেন। তার ফল তারা পেয়েছেন।

মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো তার কাছের দৃষ্টান্ত। ২৪ বছরের মধ্যে দুবার উপনিবেশ থেকে মুক্তির পরও বাংলাদেশের সমাজ স্থিতিশীলতা আসতে পারেনি, তার কারণ এখানে রাজনৈতিক দলগুলো এখনো নাগরিকদের বিভক্ত করে শাসন চালানোর নীতিতে চলেছে। যাঁরা ক্ষমতায় থেকেছেন, তাঁরা রাজনৈতিকভাবে ভিন্ন মতাদর্শের লোকদের অপর করার চেষ্টা করেছেন।

চার.

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পর ছাত্র সংসদ নির্বাচন প্রত্যাশিত হলেও এই নির্বাচন নতুন করে যে প্রশ্নটি সামনে নিয়ে এসেছে, সেটি হলো লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতি থেকে শিক্ষার্থীরা আদতেও মুক্তি পাবে কি? ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারগুলোতে যেভাবে জামায়াত ও বিএনপির নেতা-কর্মীরা অবস্থান নিয়েছিলেন, তাতে এটা স্পষ্ট যে এই অভ্যুত্থান রাজনৈতিক দলগুলোর ভাবনাকাঠামোয় তেমন কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি।

ডাকসু-জাকসু নির্বাচনকে কৌশলের রাজনীতির কাছে প্রথাগত রাজনীতির পরাজয় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অভিযোগ আছে, অভ্যুত্থানের পর থেকেই সাধারণ শিক্ষার্থীদের নামে ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন ব্যানার ও সংগঠন ক্যাম্পাসে অন্যান্য সংগঠনের কার্যক্রমে বাধা তৈরি করে। ছাত্রলীগের আমলে তাদের অনেক নেতা-কর্মী ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন সংগঠনে ঢুকে গুপ্ত হিসেবে রাজনীতি করেছেন। অভ্যুত্থানের পর তারা গুপ্ত অবস্থা থেকে প্রকাশ্যে আসে।

হলে হলে পানির ফিল্টার থেকে শুরু করে গরিব শিক্ষার্থীদের তারা সহায়তা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিয়াশীল বিতর্ক, সাংস্কৃতিক, চলচ্চিত্র সংগঠন ও ক্লাবে শিবির-সমর্থিত শিক্ষার্থীরা নেতৃত্বে দিচ্ছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ক্যাম্পইনের জন্যও বিপুল অঙ্কের টাকা খরচ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘিরে শিবিরের প্রস্তুতি ও বিনিয়োগ ছিল দীর্ঘ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে থাকা দলীয় শিক্ষকদের কাছ থেকেও তাঁরা সুবিধা পেয়েছেন। ফলে অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাস্তবতায় সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ এখন ছাত্রশিবিরের হাতে।

শিক্ষার্থীদের বড় একটা অংশের মধ্যে লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতির বিরোধিতা থাকলেও তাঁদের সামনে নতুন রাজনীতি ছিল না। ছাত্রদল কিংবা বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের ছাত্র সংগঠন—কেউই নতুন রাজনীতি হাজির করতে পারেনি। তাদের সবার রাজনীতিই ছিল প্রথাগত রাজনীতির ধারাবাহিকতা। বামেদের মধ্যে দুই-একজন নেতা উদ্দীপনা তৈরি করতে পারলেও সাংগঠনিকভাবে তারা বহুধারায় বিভক্ত আর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই প্রথাগত চিন্তায় পরিচালিত।

ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে যে মোড়কেই হোক পুরোনো ধারার লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি ফিরে এসেছে। গুপ্ত হোক, প্রকাশ্য হোক, যেকোনো লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি শেষ পর্যন্ত নিপীড়নমূলক ও নিয়ন্ত্রণমূলক হতে বাধ্য।

কেননা, ছাত্ররাজনীতিকে জাতীয় রাজনীতির গ্ল্যাডিয়েটর খেলার মঞ্চে পরিণত করা হবে না কিংবা তাদেরকে ব্যবহার করে পুরোনো রাজনৈতিক বন্দোবস্ত চালু রাখা হবে না—এমন অঙ্গীকার কোনো দলই করেনি।

শিক্ষার্থীদেরও এটা ভাবা প্র্যাকটিস করা জরুরি যে তাঁরা নিজেদের কোন ভূমিকায় দেখতে চান। ছাত্ররাজনীতির প্রয়োজনীয়তা যে ফুরায়নি, চব্বিশের অভ্যুত্থান তার প্রমাণ। কিন্তু ছাত্ররাজনীতি, শিক্ষক রাজনীতির ধরনটা কী হবে, তা নিয়ে ভাবার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে।

- **মনোজ দে**, প্রথম আলোর সম্পাদকীয় সহকারী
  (মতামত লেখকের নিজস্ব)

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো